BLACK ICE
SOFTWARE INC.
Driver Demo

আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগকারীদের স্বরূপ বিশ্লেষণ

--মুহাম্মাদ খালিদ সাইফুল্লাহ রিয়াদ

আমাদের সমাজে একশ্রেণীর মানুষ আছে, কারণে-অকারণে কথায় কথায় আল্লাহর নামে বিষোদগার করা যাদের একটা ফ্যাশন। যারা আল্লাহর নামে সমালোচনা করে, তারা আবার দুই ধরনের হয়ে থাকে। এক ধরনের মানুষ দুঃখ-কষ্ট, হতাশা-নৈরাশ্য ও ব্যর্থতার কারণে বিরক্ত হয়ে আল্লাহর উপর ক্ষোভ প্রকাশ করে। আরেক ধরনের মানুষ উদ্দেশ্যমূলকভাবে মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে সরিয়ে দেয়ার জন্য আল্লাহ তাআলাকে সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু বানায়। এ উভয় শ্রেণীর মানুষের অমূলক বক্তব্য ও অযৌক্তিক প্রচারণাকে খণ্ডন করা এবং তাদের আসল চেহারা জনসমক্ষে ফুটিয়ে তোলা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব, যাতে মানুষ এদের সৃষ্ট বিভ্রান্তির কবল থেকে আল্লাহর প্রতি নিজেদের আস্থাও বিশ্বাস অটুট রাখতে পারে।

আল্লাহর নামে অসংলগ্ন উক্তি উচ্চারণ করাটা মূলতঃ ইহুদীদের স্বভাব। তাদের বিদ্বেষপ্রসূত কথাবার্তার জবাবে পবিত্র কুরআনে আয়াত নাযিল হয়েছে। এই সমস্ত আয়াত একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে উপলক্ষ করে নাযিল হলেও জাতি-ধর্ম, বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে যে বা যারাই আল্লাহর নামে অপ্রীতিকর কথাবার্তা বলে বেড়াবে, তাদের সকলের ক্ষেত্রেই আয়াতগুলো প্রযোজ্য হবে। সূরা মায়েদার ৬৪ নং আয়াতে এরশাদ হচ্ছে, "আর ইহুদীরা বলে, আল্লাহর হাত বন্ধ হয়ে গেছে। তাদেরই হাত বন্ধ হোক। একথা বলার জন্য তাদেরকে অভিসম্পাত। বরং তাঁর উভয় হাতই উন্মুক্ত। তিনি যেরূপ ইচ্ছা ব্যয় করেন।" এ আয়াতের শানে নুযুল প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, "আল্লাহ তাআলা মদীনার ইহুদীদেরকে ধন-সম্পদ, বাগ-বাগিচা, খেত-খামার, পশুপাল ইত্যাদি নেয়ামত দিয়ে সুখী ও সমৃদ্ধশালী জীবন দান করেছিলেন। তাদের অধিকাংশ লোকই ধনী ও সম্পদশালী ছিল; কিন্তু যখন তারা আল্লাহর নাফরমানী এবং নবী মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে মিথ্যা সাব্যস্ত করে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে লাগল, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি অবারিত রহমতের হাতকে সঙ্কুচিত করলেন, এতে তারা দারিদ্র্যের করাল গ্রাসে নিপতিত হলো এবং তাদের ভাগ্য-বিড়ম্বনা দেখা দিল। তখন তাদের জনৈক নেতা নোবাশ ইবনে কায়েস বলল, আল্লাহর হাত বাঁধা হয়েছে অর্থাৎ সে কৃপণ হয়ে গিয়েছে, আল্লাহ সম্পর্কে এই কটূক্তি কতক ইহুদী সমর্থন জানালো, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের এহেন অসংলগ্ন কটূক্তির প্রতিবাদ এবং তাদের দারিদ্র্যের কারণ উল্লেখ করে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ করেন।" উল্লেখ্য, যখন তারা সম্পদশালী ছিল, তখনও আল্লাহর নামে তাচ্ছিল্য করত। মহানবী (সাঃ) যখন কুরআন শরীফ থেকে যাকাত ও সদকার বিধি-বিধান বর্ণনা করেন, তখন তারা এ সম্পর্কে বিদ্রূপ করতে গিয়ে আল্লাহর প্রতি দারিদ্রের অপবাদ আরোপ করেছিল। এ প্রসঙ্গে এরশাদ হচ্ছে, "নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের কথা শুনেছেন, যারা বলেছে যে আল্লাহ ফকীর আর আমরা ধনী! এখন আমি তাদের কথা এবং যেসব নবীকে তারা অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে তা লিখে রাখব, অতঃপর বলব, আস্বাদন কর জ্বলন্ত আগুনের আযাব।" (আল-ইমরানঃ১৮১) সুতরাং দেখা যাচ্ছে, যখন তারা আল্লাহর নেয়ামত পায়, তখন ধন-সম্পদের গর্বে মত্ত হয়ে আল্লাহকেই ফকীর-মিসকীন সাব্যস্ত করে। আর যখন এসব ধৃষ্টতার কারণে নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়, তখন আল্লাহর নামেই কৃপণতার অপবাদ দেয়। এরা সুখে থাকলে শোকরিয়া জ্ঞাপনের পরিবর্তে অহঙ্কার ও খোদাদ্রোহী মনোভাব প্রকাশ করে, আর কষ্টে পড়লে সবর ও আত্মসমালোচনার পরিবর্তে আল্লাহর প্রতি দোষারোপ করে। সূরা মায়েদার আলোচ্য আয়াতে এরপর আল্লাহ বলেছেন যে, যারা আল্লাহর হাতকে বন্ধ বলে, তাদের নিজেদের হাতই বন্ধ। অর্থাৎ, তাদের নিজেদের হাত বন্ধ হওয়াটাই তাদের দুর্গতির কারণ। আল্লাহ যখন ইহুদীদের সচ্ছল অবস্থায় দান-সদকা করার আহবান জানিয়েছিলেন, তখন তারা এতে সাড়া দেয়ার পরিবর্তে আল্লাহকেই দরিদ্র বলে উপহাস করেছিল। তাদের সেই ঔদ্ধত্যমূলক কার্পণ্যই তাদের সচ্ছলতাকে কেড়ে নিয়েছে। বন্ধ হাত দিয়ে কোন কিছু যেমন বের হতে পারে না, তেমনি ঢুকতেও পারে না। তারা তাদের হাতের ন্যায় নিজেদের মনটাকেও বন্ধ করে রেখেছে। হেদায়েতের বাণী গ্রহণে এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে তারা মানসিক কার্পণ্যের পরিচয় দিয়েছে। তারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনও করেনি, আল্লাহর পথে কোন অর্থ বা শ্রমও ব্যয় করেনি। এটা আল্লাহর প্রতি তাদের কৃপণতারই নিদর্শন। তাদের নিজেদের কার্পণ্যই নিজেদের দিকে বুমেরাং হয়েছে। মানুষের পাপ, কুফরী আর কৃপণতাই আল্লাহর কাছ থেকে নেয়ামত ও কল্যাণ আগমনের দরজা রুদ্ধ করে দেয়, আর গযব ও অকল্যাণের জন্য সকল দরজা উন্মুক্ত করে দেয়। এ সম্পর্কে এরশাদ হচ্ছে, "তোমাদের উপর যেসব বিপদ-আপদ পতিত হয়, তা তোমাদের হাতের উপার্জন ছাড়া আর কিছুই নয় এবং তিনি তোমাদের অনেক গোনাহ ক্ষমা করে দেন।" (সূরা শূরাঃ৩০) একেক ধরনের বিপদ একেক ধরনের পাপের কারণে হয়ে থাকে। ধন-সম্পদের উপর বিপদ আসে কৃপণতার কারণে, ইজ্জতের উপর বিপদ আসে নির্লজ্জতার কারণে, আর জীবনের উপর বিপদ আসে নিষ্ঠুরতার কারণে। মানুষ তার যেসব আচরণের কারণে নেয়ামত হারিয়ে থাকে তার মধ্যে প্রধান কয়েকটি কারণ হচ্ছে নেয়ামতকে অস্বীকার করা, নেয়ামতের অপব্যবহার করা, নেয়ামতের জন্য আল্লাহর হক বা মানুষের হক নষ্ট করা, নেয়ামতকে নিজে থেকেই বর্জন বা প্রত্যাখ্যান করা এবং সর্বোপরি নেয়ামতের যথার্থ ব্যবহারে কৃপণতা প্রদর্শন করা। নেয়ামতের অস্বীকৃতি বা নাশোকরী মূলতঃ দুই ধরনের হয়ে থাকে। একটি হচ্ছে নিজের সুখ-সম্পদকে নিজের যোগ্যতার অর্জন বলে আল্লাহর অবদানকে তাচ্ছিল্য করা, আরেকটি হচ্ছে সুখী ও সম্পদশালী হয়েও নিজেকে দুঃখী ও দরিদ্র বলে আল্লাহর উপর ক্ষোভ প্রকাশ করা। মানুষ যখন নিজের ধন-সম্পদ ও শক্তি-সামর্থ্যকে নিজের একচেটিয়া উপার্জন বলে দাবি করে, তখন অহঙ্কারে মদমত্ত হয়ে আল্লাহকে এই মর্মে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বসে যে, আল্লাহ পারলে তার নেয়ামত ছিনিয়ে নিক কিংবা তাকে গযব দিয়ে ধ্বংস করুক। নেয়ামতের অপব্যবহার বলতে বুঝায় নেয়ামতকে আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায় ব্যবহারের পরিবর্তে আল্লাহর নিষিদ্ধ পথে ব্যবহার করা। ইহুদীরা তাদের আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা, মর্যাদা, অর্থ-সম্পদ ও সুখ-সমৃদ্ধিকে আল্লাহর দ্বীনের বিরোধিতা করা, মানুষের উপর শোষণ-নির্যাতন চালানো আর মানুষের মাঝে অশান্তি-বিশৃঙ্খলা ও ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টির কাজেই ব্যবহার করেছিল। নেয়ামত হারানোর তৃতীয় কারণটি হচ্ছে কোন নেয়ামতকে বাড়ানো বা ধরে রাখার জন্য কিংবা নেয়ামতের অহমিকা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে আল্লাহর বিধান লংঘন করা এবং মানুষের উপর জুলুম করা। কারণ, যে জিনিস মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে সরিয়ে দেয় এবং আল্লাহর বান্দাদের প্রতি নির্দয় করে তোলে, সেই জিনিস মানুষের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়াটাই যুক্তিযুক্ত। নেয়ামত হারানোর চতুর্থ কারণটি হচ্ছে খামখেয়ালীপনাবশত নেয়ামতের প্রতি

অবজ্ঞা প্রদর্শন করে তা ফিরিয়ে দেয়া। ইহুদীদের জন্য আল্লাহ এক সময় বেহেশতী খাবার পর্যন্ত বরাদ্দ করেছিলেন, কিন্তু এই হতভাগার দল নিজেরাই বলে কয়ে সেই দুর্লভ নেয়ামত বন্ধ করিয়ে দেয়। নেয়ামত হারানোর সর্বাপেক্ষা বড় কারণ হচ্ছে নেয়ামতের ব্যাপারে কৃপণতা প্রদর্শন করা, অর্থাৎ আল্লাহর দেয়া নেয়ামতকে আল্লাহর জন্য ব্যবহারে অনীহা ও অস্বীকৃতি ব্যক্ত করা। আল্লাহর দেয়া ধন-সম্পদ, শক্তি-সামর্থ্য, মেধা ও ক্ষমতাকে যখন আল্লাহর পথে ব্যয়-ব্যবহার করতে অসম্মতি প্রকাশ করা হয়, আল্লাহর নির্দেশে কোনরূপ পরিশ্রম, কষ্ট বা ত্যাগ স্বীকারে সম্পূর্ণ অনাগ্রহ প্রদর্শন করা হয়, তখন তা আল্লাহর প্রতি নিমকহারামিরই পরিচয় বহন করে। বিশেষত যখন এই কৃপণতা একতরফাভাবে কেবল আল্লাহর প্রতিই প্রদর্শন করা হয়, তখন তা সাংঘাতিক অবিচার ও জুলুমের আওতায় পড়ে। মানুষ আল্লাহর পথে সামান্য শ্রম ও অর্থ ব্যয় করা কিংবা কোনপ্রকার ঝুঁকি নেয়ার ব্যাপারে কৃপণতার পরিচয় দেয়, অথচ দেবদেবীর জন্য আত্মহত্যা করতে কিংবা প্রাণাধিক প্রিয় সন্তানকে বলি দিতেও কার্পণ্য বা সংকোচবোধ করে না, বরং নিজেকে গর্বিত ও ধন্য মনে করে, সন্তুষ্টচিত্তে শুকরিয়া জ্ঞাপন করে। এককথায়, আল্লাহর নেয়ামতকে যেভাবে গ্রহণ করা উচিত এবং নেয়ামতের মূল্যায়ন যেভাবে করা উচিত, মানুষ যখন সেভাবে না করে নেয়ামতের ব্যাপারে বক্রতা ও ভ্রান্ত কর্মনীতি গ্রহণ করে, তখন আল্লাহ মানুষের কাছ থেকে নেয়ামত ফিরিয়ে নেন। এ প্রসঙ্গে কুরআন পাকে এরশাদ হচ্ছে, "এটা এজন্য যে, আল্লাহ কখনো পরিবর্তন করেন না সে সব নেয়ামত, যা তিনি কোন জাতিকে দান করেছিলেন, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করে; আর নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।" (সূরা আনফালঃ৫৩) অন্যত্র বলা হয়েছে, "আল্লাহ জুলুম করেন না মানুষের উপর, বরং মানুষ নিজেই নিজের উপর জুলুম করে।" (সূরা ইউনুসঃ৪৪) উল্লেখ্য, আমাদের আলোচ্য সূরা মায়েদার আয়াতে যে জুলুমটির কথা বলা হয়েছে সেটি হচ্ছে কৃপণতা তথা নিজের হাত বন্ধ রাখা। বলাবাহুল্য, এই জুলুমটির ক্ষেত্রেও আল্লাহ নির্দোষ, মানুষই দোষী। মানুষের এ কার্পণ্য স্বভাবের দৃষ্টান্তসরূপ আল্লাহ তাআলা বলেন, "বলুনঃ যদি আমার রবের রহমতের ভাণ্ডার তোমাদের হাতে থাকত, তবে ব্যয়িত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় অবশ্যই তা ধরে রাখতে। মানুষ তো অতিশয় কৃপণ।" (সূরা বনী ইসরাইলঃ১০০) আল্লাহদ্রোহী ব্যক্তিরা কেবল নিজেদের অভাব-অনটনের জন্যই আল্লাহর নামে বিষোদগার করে না, অন্যান্য মানুষের দুঃখ-দারিদ্রের জন্যও আল্লাহকে দোষারোপ করে। তারা মানুষের বিপদের অপেক্ষায় ওঁৎ পেতে থাকে, কাউকে বিপন্ন দেখলে পুলকিত হয় এবং দুরবস্থায় সুযোগে ঈমানের উপর ছোবল মারে। তারা উদ্ভূত সংকটের জন্য যেমন আল্লাহকে দায়ী করে, তেমনি প্রয়োজনে আল্লাহর উপর দোষ চাপানোর উদ্দেশ্যে কৃত্রিম সংকটও সৃষ্টি করে। ষড়যন্ত্র আর উৎপীড়নের মাধ্যমে মানুষকে যন্ত্রণার মাঝে ফেলে আল্লাহর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার প্রয়াস পায়। আল্লাহদ্রোহী জালেমরা নিজেদের অনিষ্টের ফলে সৃষ্ট দুরবস্থার জন্য আল্লাহর উপর দোষ চাপিয়ে নিজে দায়মুক্ত হতে চাইলেও ভিকটিমকে দোষ থেকে অব্যাহতি দেয় না। সেক্ষেত্রে তারা হয় ভিকটিমকে দায়ী করে, অথবা অন্য কাউকে দোষারোপ করে। এককথায়, শয়তান নিজে মানুষের অনিষ্ট সাধন করে তার দায়ভার চাপিয়ে দেয় হয় আল্লাহর উপর, অথবা আল্লাহর বান্দাদের উপর। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ কখনো মানুষের অকল্যাণ চান না, মানুষকে কষ্ট দেয়ার কোন ইচ্ছাও তাঁর নেই। মানুষকে কষ্ট দেয়া বরং তাদেরই কাজ, যারা আল্লাহকে মানুষের অমঙ্গলকামী ও কষ্টের কারণরূপে প্রচার করে। তারা নিজেদের দোষগুলোই সব আল্লাহর উপর চাপিয়ে দেয়। নিজেরা কৃপণ, অবিচারী ও জালেম হওয়ার কারণেই আল্লাহর নামে এসব অভিযোগ আরোপ করতে পারে। কেউ যদি মানুষের দরদী সেজে আল্লাহকে সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু বানায় তাহলে দেখতে হবে সে বাস্তবে মানুষের প্রতি কতটুকু সহানুভূতিশীল। কেউ নিজে যার প্রতি নির্দয় আচরণ করে, তার দুঃখেই যদি আবার আল্লাহর বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে, তাহলে বুঝতে হবে আল্লাহর বিরোধিতা করাটাই তার একমাত্র উদ্দেশ্য। আল্লাহর শত্রুরা মানুষের আর্থিক ও বৈষয়িক দুঃখ-দুর্দশার জন্য আল্লাহর উপর অপবাদ দিয়েই ক্ষান্ত হয় না, মানুষের কার্যকলাপের জন্যও আল্লাহকে দায়ী করে। পার্থিব ও পারলৌকিক শাস্তি যে মানুষের কৃতকর্মের ফল তা তারা স্বীকার করে, কিন্তু আল্লাহকেই সেসব কৃতকর্মের কর্তারূপে চিহ্নিত করে। তারা প্রচার করে, আল্লাহই আমাদের ভাল-মন্দ সব কাজ করায়, কাজেই সব কাজের জন্য আল্লাহই দায়ী। পাপের জন্য মানুষকে শাস্তি দেয়া অবিচার। তাদের কথা শুনে মনে হয়, আল্লাহর যেন মানুষের সাথে শত্রুতা আছে, কিংবা মানুষকে কষ্ট দিয়ে তিনি বুঝি খুব মজা অনুভব করেন, তাই মানুষকে শাস্তি দেয়ার সুযোগ সৃষ্টির জন্য তাদের উপর ইচ্ছামত পাপ চাপিয়ে দেন। অথচ কাউকে অপরাধ করিয়ে তারপর তাকে সেজন্য শাস্তি দেয়া দয়াময় আল্লাহর নীতি হতে পারে না, বরং এটা মূলতঃ আল্লাহর দুশমন অভিশপ্ত শয়তানেরই থিউরি। যারা মানুষকে ঘায়েল করার মওকা তৈরীর জন্য সুকৌশলে মানুষকে দিয়ে দোষ-ত্রুটি ঘটিয়ে থাকে, তারাই পারে আল্লাহর নামে অনুরূপ মতবাদ প্রচার করতে। সর্প হয়ে দংশন করা আর ওঝা হয়ে ঝাড়া এ ধরনের কুটিলতার দোষে তারাই দুষ্ট। মানুষের প্রতি ভালবাসার কারণে মানুষকে বেকসুর খালাস দেয়ার কোন মহৎ উদ্দেশ্যে তারা এসব প্রচারণা চালায় না। যুক্তিতর্কের জোরে আল্লাহর কাছ থেকে মানুষের জন্য সাধারণ ক্ষমা আদায় করে দেয়াও তাদের উদ্দেশ্য নয়। বরং মানুষকে তার কৃতকর্মের উপর সন্তুষ্ট রেখে দায়দায়িত্ব সম্পর্কে উদাসীন করে নিশ্চিন্ত মনে আল্লাহর অবাধ্যতা ও পাপের মাঝে ব্যাপৃত থাকতে উৎসাহিত করার মাধ্যমে আল্লাহর আযাবের সম্মুখীন করা এবং আল্লাহর সম্পর্কে মানুষের মনে নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টি করাই তাদের উদ্দেশ্য। আর আল্লাহ চান মানুষের কাছে প্রকৃত সত্য তুলে ধরে মানুষের মাঝে দায়িত্ববোধ জাগ্রত করতে, যাতে মানুষ আল্লাহর আযাব থেকে আত্মরক্ষা করে আল্লাহর রহমত লাভ করতে পারে। এজন্য তিনি মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন, "প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী।" (সূরা মুদ্দাস্সিরঃ৩৮) "যে কুফর করে, তার কুফরের জন্য সে-ই দায়ী এবং যে সৎকর্ম করে, তারা নিজেদের পথই শুধরে নিচ্ছে।" (সূরা রূমঃ৪৪) পুতুলের কোন চেতনা-অনুভূতি বা ইচ্ছাশক্তি নেই, কিন্তু মানুষের মাঝে তা পূর্ণমাত্রায় রয়েছে। তাই পুতুলের মুভমেন্টের ব্যাপারে তাকে দোষী করা না গেলেও মানুষের যাবতীয় কর্মতৎপরতার জন্য সে অবশ্যই দায়ী। কারণ, মানুষ যা করে, স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে বুঝে শুনেই করে। যদি কেউ কখনো না জানার কারণে অন্যায় করে, তাহলে তাকে আল্লাহ শাস্তি দেন না। "এটা এজন্য যে, আপনার রব কোন জনপদকে জুলুমের কারণে ধ্বংস করেন না এমতাবস্থায় যে, তার অধিবাসীরা গাফেল।" (সূরা আনআমঃ১৩২) অতএব, আল্লাহ কাউকে ভুলবশত বা অনিচ্ছাকৃত পাপের জন্য পাকড়াও করেন না, কেবল ইচ্ছাকৃত জুলুমের জন্যই শাস্তি দেন। অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন যে, তিনি সতর্ককারী না পাঠিয়ে কোন জাতিকে ধ্বংস করেন না। অর্থাৎ, যেকোন মানুষকে আল্লাহ প্রথমে কোন নবী-রাসূল বা অন্য কোন মানুষের কাছে কিংবা লেখাপড়া বা কোন নিদর্শন

দেখার মাধ্যমে সত্য সম্পর্কে অবগত হওয়ার সুযোগ দেন; তারপর যদি সত্য দ্বীন কবুল না করে তখন তাকে শাস্তি প্রদান করেন। শয়তানের দোসররা মানুষের দরদী সেজে আল্লাহকে অন্যায়কারী ও অবিচারী সাব্যস্ত করে মানুষকে সম্পূর্ণ নিষ্পাপ ও নির্দোষ বলে রায় দিলেও যেকোন কর্মের দায়দায়িত্ব মূলতঃ কর্তার উপরই বর্তায়। অতএব, মানুষের যেকোন দুঃখ-দুর্দশা বা পাপ-পঙ্কিলতা আল্লাহর সৃষ্ট নয়, বরং তার নিজেরই সৃষ্ট এবং সেই জিন বা মানুষ শয়তানের সৃষ্ট, যে আল্লাহর উপর দোষ চাপানোর উদ্দেশ্যে মানুষকে দুঃখ-কষ্ট ও পাপে নিমজ্জিত করে। সূরা মায়েদার আলোচ্য আয়াতে ইহুদীদের উল্লিখিত উক্তির জন্য আল্লাহ তাদের প্রতি অভিসম্পাতের ঘোষণা দিয়েছেন। অন্যত্র বলা হয়েছে, "এবং যাতে তিনি মুনাফিক নর-নারী ও মুশরিক নর-নারীদের শাস্তি দেন, যারা আল্লাহর সম্পর্কে কুধারণা করে। তাদের জন্য মন্দ পরিণাম। আল্লাহ তাদেরকে গযব দিয়েছেন, তাদেরকে লানত করেছেন এবং তাদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখেছেন। তাদের প্রত্যাবর্তন স্থল অত্যন্ত মন্দ।" (সূরা ফাত্হঃ৬) ইসলামের ইতিহাস থেকে জানা যায়, জাবরিয়া নামক সম্প্রদায় সর্বপ্রথম মানুষের কার্যকলাপের জন্যও আল্লাহকে দায়ী করতে শুরু করে। এই মতবাদের উ দ্ভাবক ছিলেন জাদ ইবনে দিরহাম এবং তিনি এই মত ইহুদীদের নিকট থেকে গ্রহণ করেন। ইহুদীদের স্বরূপ উন্মোচন ও তাদের প্রতি অভিসম্পাতের ঘোষণার পর আল্লাহ তাআলা তাদের উক্তি খণ্ডনের জন্য নিজের দানশীলতার কথা উল্লেখ করেছেন। দয়াময় আল্লাহ আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁর উভয় হাতই উন্মুক্ত ও প্রসারিত-- তিনি যেভাবে ইচছা ব্যয় করেন। অর্থাৎ, তিনি যেভাবে ব্যয় করা উপযোগী মনে করেন সেভাবে ব্যয় করেন। এই উপযোগিতা আবার দুইভাবে হতে পারে। এক, যারা কৃতজ্ঞ ও অনুগত হয়, তাদের প্রয়োজন আল্লাহ পূরণ করেন। আর যারা ইহুদীদের মত নিমকহারাম ও বিদ্রোহী হয়, তাদের রিযিক সংকুচিত করে দেন। দুই, যখন যাকে যে জিনিস যে পরিমাণ দেয়া কল্যাণকর, তখন তাকে সে জিনিস সেই পরিমাণ দেয়া হয়। কাউকে যদি কোন জিনিস বেশি দেয়ার মাঝে অকল্যাণ থাকে, আর না দেয়া বা কম দেয়ার মাঝে কল্যাণ থাকে, তখন সেক্ষেত্রে তা দেয়া হয় না বা কম দেয়া হয়। এ সম্পর্কে এরশাদ হচেছ, "যদি আল্লাহ তাঁর সকল বান্দাকে প্রচুর রিযিক দিতেন, তবে তারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করত। কিন্তু তিনি যে পরিমাণ ইচছা সে পরিমাণ নাযিল করেন। নিশ্চয় তিনি তাঁর বান্দাদের খবর রাখেন ও সবকিছু দেখেন।" (সূরা শূরাঃ২৭) অর্থাৎ, প্রতিটি মানুষ স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও নিজ সম্পদ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকত না, বরং আরো বেশি পাওয়ার আশায় অপরের সম্পদ গ্রাস করতে উদ্যত হত। অবশ্য যারা এমন লোভী ও আগ্রাসী স্বভাবের নয়, তারাও নিজেদের ধন-সম্পদের কারণে অপরের আগ্রাসনের শিকার হত। এছাড়া মাত্রাতিরিক্ত ধন-সম্পদ অনেক সময় চারিত্রিক অধঃপতনেরও কারণ হয়, যা মানুষের দুনিয়া-আখেরাত সবই বরবাদ করে দেয়। মানুষের মধ্যে অর্থনৈতিক সমতা আল্লাহ দান করেননি মানুষের অস্তিত্ব ও কল্যাণের কথা চিন্তা করেই। "তারা কি আপনার রবের রহমত বন্টন করে? আমি তাদের মধ্যে জীবিকা বন্টন করেছি পার্থিব জীবনে এবং একের মর্যাদাকে অপরের উপর উন্নীত করেছি, যাতে একে অপরকে সেবক রূপে গ্রহণ করে। তারা যা সঞ্চয় করে, আপনার রবের রহমত তদপেক্ষা উত্তম।" (সূরা যুখরুফঃ৩২) কোন শ্রেণী একতরফাভাবে অপর শ্রেণীর কাছ থেকে সেবা ভোগ করবে বা কোন শ্রেণী কেবল শোষিত ও বঞ্চিতই থেকে যাবে এটা আল্লাহর বিধান নয়। আল্লাহ মানুষকে বিভিন্ন পেশাদার শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন যাতে সকলেই পরস্পরের দ্বারা উপকৃত হয়। মানুষের সঞ্চিত ধন-সম্পদের তুলনায় যেহেতু আল্লাহর রহমতই শ্রেষ্ঠ, তাই কাউকে রহমত করার জন্য যদি তার বৈষয়িক ধন-সম্পদে একটু কমতি করার প্রয়োজন হয়, তাহলে সেটা মোটেই অনভিপ্রেত হবে না। মানুষকে রহমত করার জন্য যেমন কিছু অভাব-দারিদ্র ও দুঃখ-কষ্ট দেয়ার প্রয়োজন হতে পারে, তেমনি কাউকে গযব দেয়ার জন্যও কিছু ধন-সম্পদ ও সুখ-সম্ভোগ প্রদানের দরকার হতে পারে। তাই অনেক সময় এমনও দেখা যায় যে, যারা মানুষকে শোষণ করে সম্পদের পাহাড় গড়ে কিংবা আল্লাহর দ্বীনের বিরোধিতা করে, তাদেরকে অনেক বেশি পরিমাণে ধন-সম্পদ ও শক্তি-ক্ষমতা দেয়া হয়। এর রহস্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, "সুতরাং তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন আপনাকে বিস্মিত না করে। আল্লাহর এগুলোর দ্বারা দুনিয়ার জীবনে তাদেরকে আযাবে নিমজ্জিত রাখা এবং কুফরী অবস্থায় প্রাণবিয়োগ ঘটানো ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য রাখেন না।" (সূরা তওবাঃ৫৫) আল্লাহ আরো বলেন, "যদি সব মানুষের এক জাতি হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা না থাকত, তবে যারা দয়াময় আল্লাহকে অস্বীকার করে আমি তাদেরকে দিতাম তাদের গৃহের জন্য রৌপ্য নির্মিত ছাদ ও সিঁড়ি, যার উপর তারা চড়ত। এবং তাদের গৃহের জন্য দরজা দিতাম এবং পালংক দিতাম, যাতে তারা হেলান দিয়ে বসত। এবং স্বর্ণনির্মিতও দিতাম। এগুলো সবই তো পার্থিব জীবনের ভোগ সামগ্রী মাত্র। আর পরকাল আপনার রবের কাছে কেবল মুত্তাকীদের জন্যই নির্ধারিত।" (সূরা যুখরুফঃ৩৩-৩৫) অর্থাৎ, আল্লাহর কাছে নিছক পার্থিব ধন-সম্পদের কোন গুরুত্বই নেই। মানুষের দুনিয়া ও আখেরাতের সার্বিক কল্যাণটাই তাঁর কাছে প্রধান বিবেচ্য বিষয়। এ কল্যাণ তিনি যাদেরকে দেয়ার ইচ্ছা করেন তাদেরকে সেই কল্যাণের অধিকারী বানানোর জন্য পার্থিব দৌলত যাকে যা দেয়া দরকার তাকে তা দান করেন। যাদেরকে তিনি আখেরাতেই বঞ্চিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তারা এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে ধন-দৌলত সীমাহীনভাবে ভোগ করে নিলেও তাঁর কিছু আসে যায় না। এককথায়, আল্লাহর অনুগত ও কৃতজ্ঞ বান্দাদের পুরস্কৃত করা এবং বিদ্রোহী ও অকৃতজ্ঞদের শাস্তিদানের ব্যবস্থা করাটাই আল্লাহ পাকের উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই তিনি সম্পদ ও রিযিক বণ্টন করে থাকেন। প্রাচুর্য ও দারিদ্র বণ্টনের ন্যায় মানুষকে জীবন ও মৃত্যু দেয়ার ক্ষেত্রেও আল্লাহর উদ্দেশ্য হচ্ছে নেককারদের পুরস্কার ও অপরাধীদের শাস্তিদানের ব্যবস্থা করা। অধিক ধন-সম্পদ ও দীর্ঘ জীবন যেমন মানুষের জন্য আশীর্বাদ ও অভিশাপ দুটোই হতে পারে, তেমনি দুঃখ-দারিদ্র ও মৃত্যুর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। আল্লাহ কাফেরদের মৃত্যু দেন শাস্তি দেয়ার জন্য, আর মুমিনদের মৃত্যু দেন ভালবেসে নিজের কাছে টেনে নিয়ে পুরস্কার দেয়ার জন্য। ধন-সম্পদে দারিদ্র বা জীবনের উপর আঘাত কাফেরদের জন্য শাস্তি, পাপী মুসলমানদের জন্য কাফফারা ও প্রায়শ্চিত্য, আর নিষ্পাপ মুসলমানদের জন্য মর্যাদা বৃদ্ধির সোপান। ধনে-জনে কেউ কোন কষ্টভোগ করলে তা তার গুনাহ মাফের কারণ হয়ে যায়, যদি সে নাশোকরীর মাধ্যমে নতুন গুনাহের জন্ম না দেয়। এছাড়া মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য সকলকেই কমবেশী সুখ-শান্তি ও দুঃখ-কষ্ট দেয়ার প্রয়োজন হয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা পরীক্ষা করে থাকি এবং আমারই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।" (সূরা আম্বিয়া) একজন মানুষ কৃতজ্ঞ, নাকি অকৃতজ্ঞ; ঈমানদার, নাকি বেঈমান; ভাল, না মন্দ; তা যথাযথভাবে পরীক্ষা করার জন্য তার জীবনে ভাল ও মন্দ উভয় অবস্থা আসাটাই জরুরী। ভাল অবস্থার

প্রেক্ষিতে যেমন মানুষের আচরণ দুই ধরনের হতে পারে-- হয় সে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হবে, অথবা অহংকার ও সুখ-সম্ভোগে লিপ্ত হয়ে আল্লাহর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে; তেমনি মন্দ অবস্থার প্রেক্ষিতেও মানুষের আচরণ দুই ধরনের হতে পারে-- হয় সে আল্লাহর উপর ক্ষুব্ধ হবে, কিংবা ভীত ও অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর পথে ফিরে আসবে। অতএব, কারো জীবনে যদি ভাল ও মন্দের মধ্যে শুধু একরকম অবস্থাই আসে, তাহলে তার পরীক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, তার যথার্থ মূল্যায়ন হবে না। ফলে সে পুরস্কারের যোগ্য, নাকি শাস্তিযোগ্য, কিংবা কি পরিমাণ শাস্তি বা পুরস্কার তার প্রাপ্য, তা নির্ধারণ করা যাবে না। তাই আল্লাহ মানুষের জীবনে ভাল ও মন্দ সব রকমের জিনিস দিয়ে পরীক্ষা সম্পন্ন করার পর মৃত্যুর মাধ্যমে নিজের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে পরীক্ষার ফলাফল অনুসারে প্রতিদান দেয়ার ব্যবস্থা করেন। অনেক সময় আবার পাপ থেকে সতর্ক হবার জন্যও কিছু আঘাত লাভের প্রয়োজন হতে পারে। "গুরু শাস্তির পূর্বে আমি অবশ্যই তাদেরকে লঘু শাস্তি আস্বাদন করাব, যাতে তারা ফিরে আসে।" (সেজদাঃ২১) অর্থাৎ, আল্লাহ কোন প্রতিহিংসার বশে আমাদের শাস্তি দেন না, বরং কল্যাণের জন্যই দেন। তিনি কেবল ততটুকুই শাস্তি দেন, যতটুকু সংশোধনের জন্য অপরিহার্য। গুরু শাস্তি বলতে আখেরাতের শাস্তি এবং লঘু শাস্তি বলতে পার্থিব শাস্তি বুঝায়। এছাড়া দুনিয়াতেও মানুষ প্রথমে পাপ করলে যে পরিমাণ শাস্তি দেয়া হয়, পাপ অব্যাহত রাখলে সেই শাস্তির মাত্রাও ক্রমাগত বৃদ্ধি করা হতে থাকে। "আর আমি আপনার পূর্ববর্তী উম্মতদের প্রতিও পয়গম্বর প্রেরণ করেছিলাম। অতঃপর আমি তাদেরকে অভাব-অনটন ও রোগ-ব্যাধি দ্বারা পাকড়াও করেছিলাম যাতে তারা কাকুতি মিনতি করে। অতঃপর তাদের কাছে যখন আমার আযাব আসল, তখন কেন কাকুতি-মিনতি করল না? বস্তুতঃ তাদের অন্তর কঠোর হয়ে গেল এবং শয়তান তাদের কাছে সুশোভিত করে দেখাল, যে কাজ তারা করছিল। অতঃপর তারা যখন ঐ উপদেশ ভুলে গেল, যা তাদেরকে দেয়া হয়েছিল, তখন আমি তাদের সামনে সব কিছুর দ্বার উন্মুক্ত করে দিলাম। এমনকি, যখন তাদেরকে প্রদত্ত বিষয়াদির জন্য তারা খুব গর্বিত হয়ে পড়ল, তখন আমি অকস্মাৎ তাদেরকে পাকড়াও করলাম। তখন তারা নিরাশ হয়ে গেল।" (সূরা আনআমঃ৪২-৪৪) অর্থাৎ, আল্লাহ বিপথগামী মানুষকে নিজের পথে ফিরিয়ে আনার জন্যই গযব ও নেয়ামত দিয়ে পরীক্ষা করেন। যাকে হেদায়েত করার জন্য শাস্তি ও ভয়-ভীতি প্রদর্শন প্রয়োজন, তাকে শাস্তি দেন; আবার যে নেয়ামত পেলে কৃতজ্ঞ হয়ে ফিরে আসতে পারে, তাকে নেয়ামত দিয়ে আকর্ষণ করেন। নরমে-গরমে যেভাবে হোক, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের বৃহত্তর আযাব থেকে বাঁচিয়ে চির শান্তির দিকে নিয়ে যেতে চান। কিন্তু কোন মানুষের ক্ষেত্রে যখন এ উভয় পন্থাই ব্যর্থ হয়, শাস্তি ও নেয়ামত দুটোতেই যখন নেতিবাচক সাড়া দেয়, মানুষকে সৎপথে আনার কোন উপায়ই যখন আর অবশিষ্ট না থাকে, তখন তাকে ধ্বংস করে দেয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। মোটকথা, যারা পুরস্কার পাবার যোগ্য তাদেরকে পুরস্কার দেয়া, যারা শাস্তি লাভের যোগ্য তাদেরকে শাস্তি দেয়া এবং যারা সংশোধিত হবার যোগ্য তাদেরকে সংশোধনের ব্যবস্থা করাই আল্লাহপাকের যাবতীয় কর্মপরিকল্পনা ও বন্টননীতির মূলসূত্র। এজন্য কাকে কি পরিমাণ ধন-সম্পদ দেয়া দরকার, কাকে কতদিন বাঁচিয়ে রাখা দরকার, সে সম্পর্কে তিনিই ভাল জ্ঞান রাখেন। আর সেই জ্ঞানের ভিত্তিতেই মানুষের মধ্যে সম্পদ ও আয়ুষ্কাল বণ্টন করেন। আল্লাহ সবকিছু যদি মানুষের মর্জিমত করতেন, তাহলে তা মানুষের জন্যই ক্ষতিকর হতো। আল্লাহ বলেন, "সত্য যদি তাদের কামনা-বাসনার অনুসারী হতো, তবে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এগুলোর মধ্যবর্তী সবকিছুই ওলট-পালট হয়ে যেত। বরং আমি তাদেরকে দান করেছি উপদেশ, কিন্তু তারা তাদের উপদেশ অনুধাবন করে না।" (সূরা মুমিনূনঃ৭১) মানুষের প্রাচুর্য-দারিদ্র, হায়াত-মউত ও সুখ-দুঃখের ন্যায় পাপ-পুণ্যের ব্যাপারটাও আল্লাহ তাআলা ইনসাফ অনুসারেই বন্টন করেন। যে যেই পরিমাণ সওয়াব বা গুনাহের উপযুক্ত, তাকে সেই পরিমাণ নেকী বা পাপ উপার্জন করারই সুযোগ দেয়া হয়। তাই বলে আল্লাহ ভাল-মন্দ কারো উপর জোর করে চাপিয়ে দেন না। কিন্তু তিনি যেহেতু আলেমুল গায়েব, তাই তিনি আগে থেকেই জানেন ভবিষ্যতে কে কি করবে। আল্লাহ মানুষের জন্য পাপকেও সহজ করে দেননি, পুণ্যকেও কঠিন করে দেননি। যে যেই কাজে পরিশ্রম ও সাধনা বেশি করে, তার জন্য সেই কাজই সহজ হয়, পরিবেশ-প্রকৃতিও সেই কাজের জন্যই অনুকূল হয়ে যায়। আল্লাহ মানুষকে কোন কলের পুতুলরূপে সৃষ্টি করেননি। তিনি কোন অবুঝ শিশু নন যে, বসে বসে পুতুল নাচানোর খেলা খেলবেন। মহান আল্লাহর সুস্পষ্ট ঘোষণা, "আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যে যা আছে, তা আমি খেলার ছলে সৃষ্টি করিনি। আমি যদি ক্রীড়া উপকরণ সৃষ্টি করতে চাইতাম, তবে আমি আমার কাছে যা আছে তা দ্বারাই তা করতাম, যদি আমাকে করতে হত।" (সূরা আম্বিয়াঃ১৭,১৮) অর্থাৎ, দয়াময় আল্লাহ যাবতীয় বিনোদন চাহিদা থেকে মুক্ত। আর যদি খেলাধূলার ইচ্ছা হয়েও থাকত, তবুও আপন বিনোদনের জন্য জড় পুতুল, কম্পিউটার বা ভিডিও গেইম জাতীয় একটা কিছু বানিয়ে নিলেই চলত। জীবন্ত প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা দয়াময়ের পক্ষে অকল্পনীয়। বিশ্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্য খেলা-তামাশা নয়, বরং ন্যায়বিচার সম্পন্ন করা। আমরা জানি, ন্যায়বিচারের অনিবার্য দাবি হচেছ যে পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য তাকে পুরস্কার প্রদান করা, আর যে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য তাকে শাস্তি প্রদান করা। কিন্তু জিন ও মানুষকে সৃষ্টি না করলে এ কাজটিই অসম্পূর্ণ থেকে যেত। তাই আল্লাহ যাদেরকে পুরস্কার বা শাস্তির যোগ্য মনে করেছেন তাদেরকে জ্ঞানবুদ্ধি ও শক্তি-সামর্থ্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং সমগ্র বিশ্বকে তাদের জন্য নেয়ামত ও নিদর্শন হিসেবে সৃষ্টি করেছেন, যাতে কৃতজ্ঞ ও অকৃতজ্ঞদের চিহ্নিত করা যায়। কারণ, কৃতজ্ঞতাই ভাল-মন্দের মাপকাঠি। "আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি তার উপার্জনের ফল পায়। তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।" (সূরা জাসিয়াঃ২২) আল্লাহ মানুষকে যেসব দ্রব্য-সামগ্রী, ক্ষমতা ও ঝোঁক-প্রবণতা দান করেছেন, সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার যোগ্যতাও দিয়ে দিয়েছেন এবং তা দিয়ে ভাল-মন্দ উভয় ধরনের উদ্দেশ্য সাধন করার ক্ষমতা দিয়েছেন। এখন মানুষ যদি আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতকে একতরফাভাবে অসৎ উদ্দেশ্য সাধনেরই কাজে লাগায়, আল্লাহর দেয়া সম্পদ ও ক্ষমতাকে অপব্যবহার করে, তাহলে তার দায়দায়িত্ব কিছুতেই আল্লাহর উপর বর্তায় না, কারণ তিনি তা করতে বলেননি। পাপের পক্ষে আল্লাহর নির্দেশ, সম্মতি, সহযোগিতা কিছুই নেই, তারপরও মানুষ পাপকে আল্লাহর দান মনে করে। আর পুণ্য কাজের পক্ষে আল্লাহর নির্দেশ, সম্মতি, সহযোগিতা, পৃষ্ঠপোষকতা সবকিছু বর্তমান থাকা সত্ত্বেও পুণ্যকে মানুষ নিজের উপার্জন মনে করে। আর একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা তাঁর নিয়মেরই প্রতিফলন। তিনি যাবতীয় স্বার্থচিন্তা, স্বেচ্ছাচারিতা ও খামখেয়ালীপনার উর্ধ্বে। একমাত্র ন্যায়বিচার করাই তাঁর ইচ্ছা। অতএব, তাঁর পক্ষে ইচেছমত কাজ করার অর্থই হচেছ ইনসাফের মানদণ্ড অনুযায়ী রহমত ও গযব বন্টন করা। অবশ্য কুরআনে এমন কথাও বলা

হয়েছে, "আল্লাহ জেনেশুনে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন।" (জাসিয়া) কাফেররা যেহেতু আল্লাহর ইচছার বিরুদ্ধে পাপ করতে পেরে গর্ববোধ করে এবং আল্লাহকে ফাঁকি দেয়ার মাধ্যমে আল্লাহর ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করে, তাই তাদের এ মনোভাবকে খণ্ডনের জন্যই আল্লাহ এ ধরনের উক্তি করেছেন। কাফেরদের পাপের সংকল্পে অটল থাকতে দেখে বিরক্ত হয়েই আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন যে, তিনিই তাদের এরূপ অবস্থায় রাখতে চান। এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ পাপ করান, বরং তাদের পাপে বাধা দেয়ার ইচছা কেবল আল্লাহ পরিত্যাগ করেছেন। আল্লাহ তাঁর প্রতি আরোপিত অক্ষমতা ও অসহায়ত্বের অপবাদ খণ্ডনের জন্যই এরূপ মন্তব্য করে থাকেন। আল্লাহ মানুষকে হেদায়েত করতে চান, কিন্তু হেদায়েত গ্রহণ করা না করা সম্পূর্ণ মানুষেরই এখতিয়ারভুক্ত। কেউ যদি কাউকে কোন উপহার দিতে চায় এবং সে যদি নিতে না চায়, তাহলে তা দেয়া সম্ভব নয়। অবশ্য জোর করে গ্রহণ করতে বাধ্য করা যায়, কিন্তু চাপের মুখে কোন কিছু গ্রহণ বা বর্জনের মাঝে কোন কৃতিত্ব নেই, এতে মানুষের ভাল-মন্দের বিচার হয় না। আল্লাহ তাকেই হেদায়েত দেন যে তা পেতে আগ্রহী হয়। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যে মনোনিবেশ করে তাকে নিজের দিকে পথপ্রদর্শন করেন।" (সূরা রাদ) আল্লাহ মানুষকে গযব দেয়ার জন্য অযুহাত অন্বেষণ করেন না, বরং রহমত করার জন্যই উছিলা তালাশ করেন। মানুষকে পাপ ও অকল্যাণ থেকে রক্ষা করা এবং পুণ্য ও কল্যাণ দান করতে দয়াময় আল্লাহ সর্বদাই অকৃপণ। যে কেউ আন্তরিকভাবে তা কামনা করবে, সে এ ব্যাপারে আল্লাহর দু'হাত উন্মুক্তই দেখতে পাবে।

মোটকথা, আল কুরআনের বক্তব্য এবং বাস্তব যুক্তি ও দলিল-প্রমাণের নিরীখে আল্লাহর বিরুদ্ধে কোন ধরনের অভিযোগই ধোপে টেকে না। আল্লাহর শত্রুরা আল্লাহকে আমাদের অকল্যাণকামী ও নিজেদেরকে কল্যাণকামী বলে প্রমাণ করতে চাইলেও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই আমাদের কল্যাণকামী এবং তারাই অকল্যাণকামী। আল্লাহ আমাদেরকে কোন শাস্তি বা পরীক্ষার সম্মুখীন করলে তারা সেটাকে অহেতুক কষ্টদান বলে চিহ্নিতকরে, আর নিজেরা আমাদের উপর যেসব নির্যাতন-নিষ্পেষণ চালায় সে সম্পর্কে দাবি করে যে, তা আমাদের মঙ্গলের জন্যই করে। অথচ তারা যা কিছু করে আমাদের উপর তাদের শত্রুতা ও কুমতলব চরিতার্থ করার জন্য। পক্ষান্তরে আল্লাহই সবকিছু আমাদের মঙ্গলের জন্য করে থাকেন। অতএব, আল্লাহর বিরুদ্ধে অপপ্রচারকারীদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আল্লাহর প্রতি শর্তহীন আস্থা ও আনুগত্য স্থাপন করতে পারলেই ওদের চক্রান্ত মাঠে মারা যাবে-- আমাদের দ্বীন ও দুনিয়ার কামিয়াবি নিশ্চিত হবে।